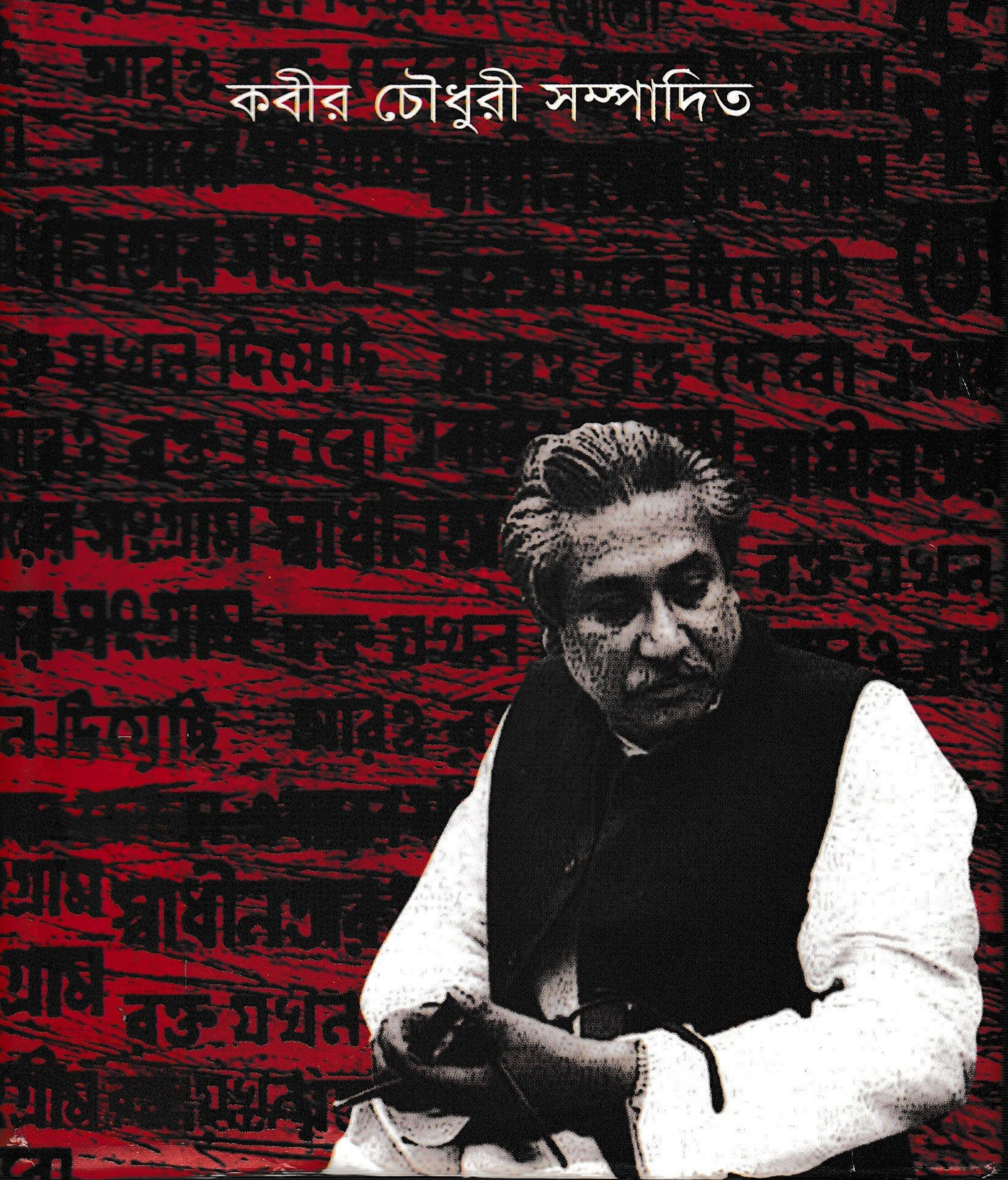
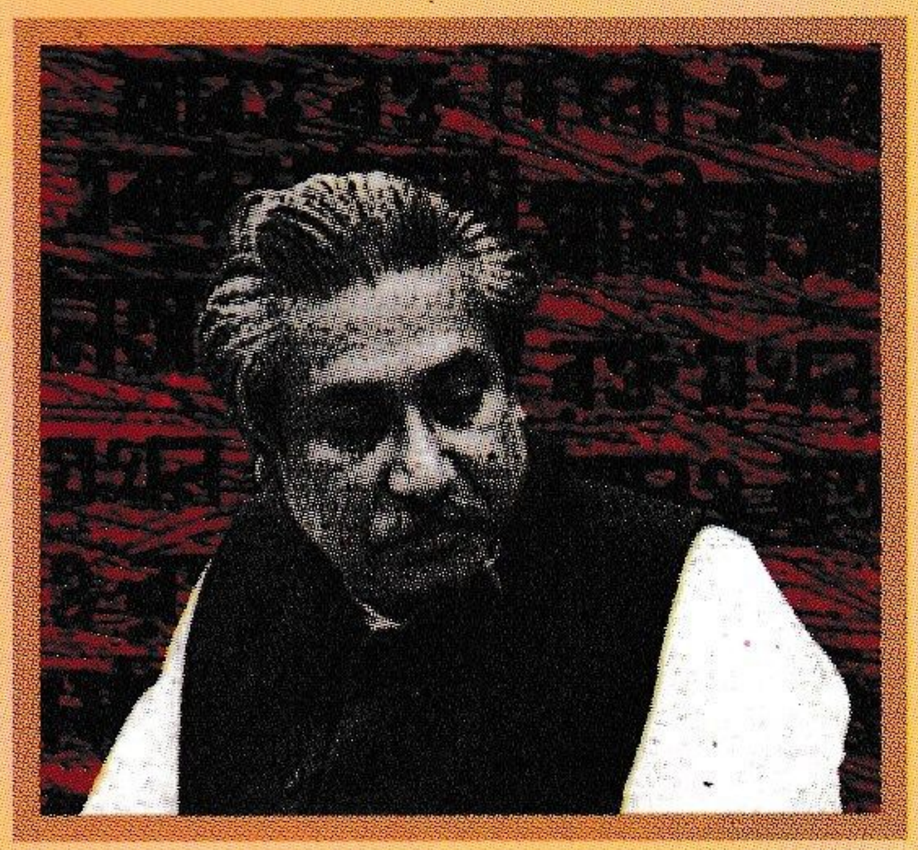
বঙ্গবন্ধু

জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক

কবীর চৌধুরী সম্পাদিত





বিংশ শতকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আর সে অর্জনের অনন্য রূপকার নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশবিরোধী শক্তির হাতে সবংশে নৃশংসভাবে প্রাণ হারালেও তিনি সদা-জীবন্ত কারণ বাংলাদেশ আর শেখ মুজিব সমার্থক শব্দ। টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমান এবং সায়েরা খাতুনের ছেলে মুজিব কিভাবে নিজেকে ধাপে ধাপে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুর স্তরে তা গভীর বিস্ময় ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ব্যাপার। শুধু নিজ জাতির স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্বদান নয় বরং যোগ্য হাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজও শুরু হয়েছিল তাঁর হাতে। যে বাংলাদেশবিরোধী শক্তি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, এমনকি হত্যার বিচার রুখতে আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেছে তারাই আজ বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে অবমূল্যায়িত করার চক্রান্তে লিপ্ত। কারণ তাঁকে আড়াল করলেই সম্ভব পরাজিত সাম্প্রদায়িক-গণবিরোধী ভাবধারার পুনর্বাসন।

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক' বইতে আলো ফেলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু জীবনের অনেক অজানা, আধ-জানা বিষয়ে। এখানে একদিকে উন্মোচিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনালেখ্য আরেক দিকে তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা।

২০২০ সালের বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে এ বই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে একটি দালিলিক প্রতিবাদ।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

অন্বেষা প্রকাশন

বঙ্গবন্ধু

জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(১৭ মার্চ ১৯২০–১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু
জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক

কবির চৌধুরী সম্পাদিত

অন্বেষা
অন্বেষা প্রকাশন

জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক
কবির চৌধুরী সম্পাদিত

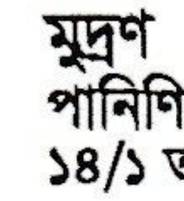
স্বত্ব © লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১০

অন্বেষা ১৭৬



প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
পানিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা মাত্র

Bangabandhu : Jononayok Theke Rastronayok
Edited by Kabir Chowdhury.
First Published February Book Fair 2010
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

e-mail : annesha2005@gmail.com

Price : Tk. 600.00 only **US $20.00**

ISBN : 984 70116 0126 7 Code : 176

উৎসর্গ

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকার

সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ ও বিদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ইতিমধ্যে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, বক্তৃতা-ভাষণে অনেক কথা বলা হয়েছে, প্রায়শই হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির জনকের ক্ষেত্রে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এমন কতিপয় গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে যাদের নিয়ে গৌড়জন নিরবধিকাল অহঙ্কার করতে পারে এবং যাদের মধ্যে তারা চিরদিন খুঁজে পাবে অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মকর্ম, স্বদেশপ্রেম, দেশকে স্বাধীন করার জন্য বীরের মতো আত্মাহুতিদান প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে যেসব শ্রেষ্ঠ বাঙালির কথা আমাদের সহজেই মনে পড়ে তাদের মধ্যে রয়েছেন অতীশ দীপঙ্কর, চণ্ডীদাস, লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, শ্রী চৈতন্যদেব, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, তিতুমীর, সূর্য যেন ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, সাঁতারু ব্রজেন দাস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। এইসব বিশাল ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম কেন্দ্রে স্থান দিয়েছি, তাঁকে অভিহিত করেছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রধানত একটি কারণে। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে অজস্র দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে, ব্যাদিতমুখ মৃত্যুকে বারবার পরাস্ত করে তিনি তাঁর স্বপ্নকে তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হন, প্রতিষ্ঠা করেন স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামের একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র, তিনি হয়ে ওঠেন জাতির জনক। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন এমন নতুন কিছু নয়। যাঁরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে এ-স্বপ্ন দেখেছিলেন নানা কারণে তাঁরা সে-স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি। এর মধ্যে কাল ও ইতিহাসেরও একটা ভূমিকা ছিল। তবে ইতিহাস যেমন নায়ক সৃষ্টি করে, তেমনি নায়কও ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বঙ্গবন্ধু তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই জায়গায় পৌঁছবার জন্য তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয় দীর্ঘকাল আগে থেকে। নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রগতিশীলতার পথে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়।

নিপীড়িত ও বঞ্চিতের জন্য দুঃখবোধ করা, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা নেয়া, নিজের স্বার্থের কথা না ভাবা শেখ মুজিবের চরিত্রের এইসব গুণাবলি তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনে ছাত্র থাকাকালীন এমনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন গোপালগঞ্জ স্কুলের ছাত্র তখন এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একবার গোপালগঞ্জে গিয়েছিলেন। তাঁদের সেখানে একটি জনসভায় বক্তৃতাদানের কর্মসূচি একটি মহল পণ্ড করার উদ্যোগ নিলে কিশোর মুজিব তীব্র প্রতিবাদী অবস্থান নেন, যার পরিণামে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। সেই প্রথম কারাবাস। সেটা ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজত্বের কাল। তারপর ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে নয়া-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ন্যায় ও সত্যের পক্ষে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় সেই চেতনা বিকাশের একটি পর্ব আমরা লক্ষ করি।

১৯৪৭-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং পিতার ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনার চাইতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই তাঁর জন্য মুখ্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদবিরোধী প্রগতিশীল বহু বাঙালি মুসলমানের মতো শেখ মুজিবও তখন মুসলিম লীগের হয়ে নানা সংগ্রামী কর্মসূচিতে অংশ নেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য অনেকের মতো তাঁর চোখেও তখন মুসলিম লীগের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র ও শ্রমজীবী গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চিন্তাবর্জিত সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় গোঁড়ামিঘেঁষা পুনরুজ্জীবনবাদী পশ্চাদমুখী প্রকৃতিটি ধরা পড়ে নি। কিন্তু অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দ্রুত উপলব্ধি করলেন যে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে কোনো জাতি গঠিত হয় না। অসাম্প্রদায়িক তিনি ছিলেন গোড়া থেকেই। মি. জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের শূন্যগর্ভতা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে সেই চেতনা আরো বিকশিত হলো। আরো বিকশিত হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও শোষণবিরোধী চেতনা। নবার্জিত পাকিস্তানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ যে সংরক্ষিত হবে না, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তথা বাঙালিদের আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা ও অধিকার নতুন এই রাষ্ট্রে শুধু যে উপেক্ষিত হবে তাই নয়, নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিতও হবে, এ সত্যটি বুঝতে তাঁর বেশি দেরি হয় নি। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা পূর্ব পাকিস্তানিদের মাতৃভাষা বাংলাকে কোণঠাসা করে সে জায়গায় উর্দু প্রতিষ্ঠার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীগণ এর বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বরে, একই বছরে, দু'বার তাঁর প্রতিবাদী কার্যাবলির জন্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থ-রক্ষার সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানের জন্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন এই শাস্তি পান। ভবিষ্যতে সুবোধ আচরণের মুচলেকা দিয়ে তারা এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করলেও শেখ মুজিব ভিন্ন ধাতুতে গড়া ছিলেন বলেই তা করতে পারেন নি। তিনি অলিখিত মুচলেকা দিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী আপোষহীন সংগ্রামের কাছে এবং সে-অঙ্গীকার তিনি কখনো ভঙ্গ করেন নি। আইন বিভাগে তাঁর ছাত্রপদ বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে তিনি ঈষৎ কৌতুক ও ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, একদিক থেকে এটা ভালোই হলো, এখন থেকে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সময় প্রত্যেকবারই পেনাল কোডের কোন ধারা আমি ভঙ্গ করছি তা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের এই আন্দোলনের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি শামসুর রাহমান তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন :

'শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আমরা কিছুসংখ্যক সাধারণ ছাত্র তখন ভাইসচ্যান্সেলারের বাসভবন ঘেরাও করেছিলাম... ভাইসচ্যান্সেলারের সবুজ পাতা-অলা ছোট ছোট গাছের বেড়া ঘেরা বাসভবনের সামনে, মনে পড়ে, দশাসই ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়েছিলাম। একটি বলবান অশ্বের খুরের ঠোকর আর পুলিশের ব্যাটের বাড়ি খেতে খেতে বেঁচে যাই কোনোমতে। দীর্ঘকায় কান্তিমান শেখ মুজিব তাঁর কথা এবং জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করছিলেন, যোগাচ্ছিলেন সাহস। সেদিন ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে থেঁৎলে গেলেও হয়ত কোনো খেদ থাকত না। প্রকৃত নেতার প্রেরণার শক্তি বোধহয় এই রকমই হয়।'

শেখ মুজিব হঠাৎ করে নয়, ধাপে ধাপে, বিভিন্ন সময়ে, সাহস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে নানান সঙ্কটের সার্থক সমাধান করে, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাঁর বজ্রকঠোর সঙ্কল্প, আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের বিবিধ গুণাবলি দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারণের অপার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করেন। এভাবেই একসময় তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার বন্ধু, বঙ্গবন্ধু, বাঙালির স্বাধীনতাসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণাদাতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনন্য প্রতীক পুরুষ।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আমাদের এই ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় প্রধানত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চেতনাকে আশ্রয় করে। ১৯৪৮ থেকে, বিশেষ করে ১৯৫২ সাল থেকে, এখানে উপরোক্ত ধারার বিপরীতে

ভাষাভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, দেশজ ঐতিহ্যলালিত জাতীয় চেতনাশ্রয়ী আরেকটি ধারা বিকশিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা প্রয়াত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন একটি লেখায় বলেছেন :

'ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা থেকে ভূখণ্ডভিত্তিক জাতীয়তার যে ঐতিহাসিক রূপান্তর তার প্রধান সূত্রধর ও মধ্যমণিরোমণি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান।'

রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে শেখ মুজিবের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করা। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্বপাকিস্তানের স্বয়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়।

আগস্টের গণপরিষদে শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে এ অঞ্চলের মানুষের দাবি এই ভূখণ্ডের নাম হবে বাংলা। 'বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য দুই-ই রয়েছে।' ১৯৫৫-এর অক্টোবরে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহৃত হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি জয়যুক্ত হলো। এর পেছনে শেখ মুজিবের ভূমিকা ছিল কেন্দ্রীয়। শেখ মুজিব আবার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শেখ মুজিব কখনো আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৫৬ সালে পূর্বপাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে তাঁকে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিদমন ও ভিলেজ এইড দফতরের দায়িত্ব দেয়া হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে উৎসাহী না হলেও দায়িত্বলাভের পর তিনি এ অঞ্চলের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের আমদানি রপ্তানি দফতরকে করাচির স্বৈরাচারী ও পশ্চিমপাকিস্তানের পক্ষে নির্জলা পক্ষপাতদুষ্ট কর্তৃত্ববলয় থেকে মুক্ত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে জুট মার্কেটিং করপোরেশন ও ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের মতো সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের বিষয় হয়ে আছে। কিন্তু বেশিদিন তিনি মন্ত্রী থাকেন নি। আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী তিনি ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনপ্রাণ ঢেলে দেন।

এরপর শেখ মুজিবের বিকাশ বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে সারা দেশে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাঙালিরা পাকিস্তানের শাসন-শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আইয়ুব খান ও পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর আইয়ুবের বশংবদ

মোনেম খান শেখ মুজিবকে তাঁদের অন্যতম শত্রু বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেন। সামরিক শাসন প্রবর্তনের চারদিনের মাথায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। একের-পর-এক তাঁকে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে হয়রানি করা হতে থাকে। প্রায় চৌদ্দ মাস কারাগারে কাটাবার পর মুক্তি দিয়ে আবার জেলগেটেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬১-র শেষ দিকে হাইকোর্টে রিট আবেদনের মাধ্যমে মুক্তিলাভের পর তিনি সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারের লক্ষ্যে গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছুটা জানলেও অনেক কিছুই এখনো অজ্ঞাত। এ ব্যাপারে উপযুক্ত গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৯৬২ সালের গোড়ার দিকে জননিরাপত্তা আইনে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ৬২-র মাঝামাঝি সময়ে শেখ মুজিব কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় তিনি আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি লাহোর গেলেন। সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে ওই ফ্রন্টের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এ সময়ই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্রনেতাদের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত ১৯৪৮ সালেই শেখ মুজিবের চিত্তে, হয়ত তাঁর সচেতন মনের অজান্তেই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি অস্পষ্ট স্বপ্ন আভাসে ইঙ্গিতে জাগতে শুরু করেছিল। ১৯৫২-তে বাংলাভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই সুপ্ত স্বপ্নের বীজ যে তাঁর মনের মাটিতে উপ্ত হয়েছিল এমন ধারণা করলে তা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু তারপরও অনেক কাজ বাকি ছিল। জলসিঞ্চনের কাজ, সার দেবার কাজ, আগাছা উৎপাটনের কাজ, রোদ-হাওয়া লাগাবার কাজ। ১৯৬৬ পর্যন্ত এইসব কাজ চলতে থাকে এবং ওই বছরেই সেই স্বপ্নের বীজ থেকে জন্ম নেয়া একটি সতেজ চারাগাছ বাংলার আপামর মানুষকে চঞ্চল ও শিহরিত করে তুলল।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলেন। ওই ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির ম্যাগনা কার্টা, তার মুক্তিসনদ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত শেখ মুজিব পরিচালিত ছয় দফা আন্দোলনই ছিল দেশের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। ওই আন্দোলনই আমাদের নিয়ে যায় স্বাধীনতার দোরগোড়ায়। শেখ মুজিবের

রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গৌরবময় অধ্যায় হলো ছয় দফা আন্দোলনে নেতৃত্বদান, যা অনিবার্যভাবে একসময় এক দফা তথা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং শেখ মুজিবকে নিয়ে যায় বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তরিত হবার দিকে। ছয় দফার ঘোষণাদানের পর ১৯৬৬-এর ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬-র প্রথম তিন মাসে তিনি আটবার গ্রেপ্তার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা করার পর তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমাণযোগ্য আইনভঙ্গকারী সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে তাঁকে একনাগাড়ে দীর্ঘকাল বন্দি করে রাখা সম্ভব হচ্ছে না দেখে পাকিস্তানের আইয়ুবশাহী সরকার এবার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনলেন।

১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলো। স্পষ্টতই এই মামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া। ঢাকা সেনানিবাসের নির্জন ক্ষুদ্র কারাপ্রকোষ্ঠে তাঁর উপর দুঃসহ অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়, কিন্তু তিনি একমুহূর্তের জন্যও ভেঙে পড়েন নি। নিশ্চিত মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শন বা পরম আকর্ষণীয় পুরস্কারের প্রলোভন কিছুই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি থাকা অবস্থায় তা যেমন পারে নি, তেমনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের লায়ালপুর সামরিক জেলে যখন তাঁর গোপন বিচার শুরু হয় এবং সেই প্রহসনমূলক বিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে তাঁকে যখন প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয় তখনো তা পারে নি। 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্তভাবনাহীন', শেখ মুজিব ছিলেন এ প্রত্যয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি এবং ওই দু'বারই শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভূমিকা সার্থকভাবে সম্পন্ন করার জন্যই যেন নিয়তি তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তখন শুধু নিয়তি নয়, নিয়তি এবং ইতিহাস একসঙ্গে কাজ করেছিল। ১৯৬৮-তে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পর ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের ৬ দফাসহ ছাত্রদের ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং ওই পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে অভূতপূর্ব সংগ্রামী গণআন্দোলন গড়ে তোলে। নিষ্ঠুর ও নির্বোধ পাক-সরকার কঠোর দমননীতির পথ বেছে নেয়। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ও ক্যারিসম্যাটিক

নেতৃত্বের স্বরূপ তারা তখনো সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নি। 'জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব' প্রভৃতি স্লোগানে সকাল-সন্ধ্যা ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকে। সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা ও কার্ফ্যু জারি করা হয়, আর জনগণ কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে তা ভঙ্গ করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্যে নিয়োজিত প্রধান বিচারপতির বাসভবনে জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ-ইপিআর গুলি চালায়, তবু আন্দোলন থামে না। বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থান অদমনীয় হয়ে উঠলে সরকার ১৯৬৯-এর ১লা ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানালো এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিল। অসামান্য নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তিদানের প্রস্তাব পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে গণমানুষের অব্যাহত চাপের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ঢাকার রাজপথ আবার স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হলো। এবারকার স্লোগান : 'জেলের তালা ভেঙেছি শেখ মুজিবকে এনেছি।' মুক্তি পাবার পরদিনই, অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি, সেদিনের রেসকোর্স ময়দান, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবকে এক বীরোচিত সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয়। প্রায় দশ লক্ষ ছাত্র-জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এরপর ঘটনা দ্রুত গড়িয়ে যেতে থাকে। ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করে বলেন যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কোনো বিকল্প নেই। এই দাবি অগ্রাহ্য হলে তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। পরিস্থিতি ক্রমেই বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে যেতে শুরু করে। ২৫ মার্চ সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে আইয়ুব খানের জায়গায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু বাঙালি জনগণকে স্বায়ত্তশাসন দানের কোনো উদ্যোগ গৃহীত হলো না। অবশ্য তা প্রত্যাশিতও ছিল না। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে এ-ভূখণ্ডের নতুন নামকরণ করলেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বললেন, আমাদের আবাসভূমির নাম হবে পূর্ব পাকিস্তান নয়, তা হবে বাংলাদেশ। পরিস্থিতি ক্রমেই অপ্রত্যাবর্তনীয় বিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছিল। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু আবার আওয়ামী লীগের সভাপতি

নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামী গণআন্দোলন চলতে থাকলেও তিনি তার পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক পথেও বাঙালির অধিকার আদায়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকলেন না। আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। '৭০-এর জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। অক্টোবরের শেষ দিকে জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর কাছে একই আবেদন করলেন। তারপর অকস্মাৎ এ অঞ্চলের মানুষের ওপর নেমে এল এক চরম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নভেম্বরের গোর্কিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে ও বিপুল সম্পদ বিধ্বংস হলে বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে দুর্গত এলাকায় চলে যান এবং সে অঞ্চলের দুর্ভাগ্যপীড়িত আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন শাসকদের ঔদাসীন্যের তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই বঙ্গবন্ধু হতেন অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান। কিন্তু পাকিস্তানের হাতেগোনা স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ছাড়া ইয়াহিয়া-ভুট্টোচক্রের কারো পক্ষেই সেটা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। '৭১-এর ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্র থেকে তাঁর অবিস্মরণীয় ঘোষণায় বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। 'অমোঘ দৈববাণীর মতো তিনি উচ্চারণ করলেন, 'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।' তাঁর ওই ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলভাঙ্গার আহ্বার জানিয়ে তিনি বললেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লা।... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' আমাদের মনে পড়ে নেতাজী সুভাষ বসুর আহ্বানের কথা, 'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ ফ্রীডম!' বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ হিসাবে সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মধ্যে ছিল সাহস, প্রত্যয়, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও দেশবাসীর প্রতি গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হবার দিক-নির্দেশনা। সর্বোপরি তার মধ্যে ছিল 'আমি আজ এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম'-এর মতো প্রত্যক্ষ উচ্চারণ ছাড়াই প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতার ঘোষণা। শুধু স্বাধীনতা নয়, মুক্তির কথাও বললেন বঙ্গবন্ধু যার তাৎপর্য আরো গভীর ও ব্যাপক। ৭ মার্চে যদি তিনি স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ঘোষণা দিতেন তাহলে ওই রেসকোর্সের ময়দানে সেদিনই লক্ষ লক্ষ বাঙালির নিহত হবার একটা বাস্তব সম্ভাবনা ছিল। তার চাইতেও বড় কথা, সেদিন ওই রকম প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বিশ্বের দরবারে তিনি সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত হতেন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং তার পরেও, আন্তর্জাতিক মহল থেকে

আমরা যে ব্যাপক সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছিলাম তা পেতাম না। যুগোপযোগিতা ও আবেদনের গভীরতার দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে আব্রাহাম লিঙ্কনের বিখ্যাত গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে প্রশংসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেটা সঙ্গতই হয়েছে, তবে উল্লেখ করা দরকার যে বঙ্গবন্ধুর পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছিল লিঙ্কনের চাইতে অনেক বেশি সঙ্কটময় ও অগ্নিগর্ভ। বঙ্গবন্ধুর শব্দচয়নে একটু ভুল হলে, ঝোঁকের একটু অপপ্রয়োগ ঘটলে, একদিকে বর্বর পাক সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করার সুযোগ পেত, অন্যদিকে স্বাধীনতা-পাগল লক্ষ লক্ষ বাঙালি হতাশায় ভেঙে পড়ত। বঙ্গবন্ধু এর কোনোটিই ঘটতে দিলেন না। প্রমিত বাংলায় তিনি মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা বললেন, আবার একান্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে আঞ্চলিক উচ্চারণে বাঙালিকে যে আর কেউই দাবায়ে রাখবার পারবে না সেকথাও সবাইকে জানিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে তাঁর আহ্বানে পাক সরকারের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ উদ্দীপ্ত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তার পাশে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকেও নিষ্প্রভ মনে হয়। বস্তুতপক্ষে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত, পাক জল্লাদ-বাহিনী কর্তৃক গণহত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পূর্ব নাগাদ, তিনি ছিলেন এদেশের মানুষের মুকুটহীন সম্রাট। সমগ্র জাতির অলিখিত ম্যান্ডেট পাওয়া, সর্বক্ষমতাপ্রাপ্ত, একক প্রতিনিধি শেখ মুজিবের প্রতিটি নির্দেশ তখন সকল বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখনই বাংলার মানুষ স্বশাসন বলতে কী বোঝায়, মুক্ত স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রের অর্থ কী, বিশ্ব-জাতিসভায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পূর্বেই তার একটা ধারণা পাওয়া ও তার কিছুটা স্বাদ অনুভব করে। বাংলার মানুষ ওই কয়েকটি দিন নব্য ঔপনিবেশিক, শোষণলিপ্সু, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসে বদ্ধপরিকর পাক সরকারকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর একটি অঙ্গুলি হেলনে তখন 'অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে স্তব্ধ হুকুমদার।' ওই সময়, যখন সরকারি কর্মচারীসহ বাংলাদেশের মানুষের পাকবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে, তখন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় কবি জসীম উদ্‌দীন ঢাকা রেডিও থেকে 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যার কয়েকটি চরণ ছিল নিম্নরূপ :

'মুজিবুর রহমান
ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিউগারী বান।
বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে
জ্বালায় জ্বালিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেহে
জীবন দানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনানী তব পাছে
তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

রাজভয় আর কারাশৃঙ্খল হেলায় করেছে জয়
ফাঁসির মঞ্চে মহত্ত্ব তব কখনো হয় নি ক্ষয়।
বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ।'

ওই সময়ে রাজপথে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী সংগ্রামী মানুষের জোয়ারকে বঙ্গবন্ধু বিন্দুমাত্র উচ্ছৃঙ্খল হতে দেন নি। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও তাঁর নেতৃত্বে অবিচল আস্থার কারণে সেদিন সারা দেশের মানুষ তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন করেছে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলেছে, ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর মরণপণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গ্রামেগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, যুদ্ধাহতদের সেবাশুশ্রূষা করেছে, গেরিলাযোদ্ধাদের জন্য খবর সংগ্রহ করেছে, তাদের শত্রুর ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছে।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চেই বঙ্গবন্ধু নিহত হতে পারতেন। তিনি সেটা জানতেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন বন্দি জীবনযাপনের সময়ও তিনি নিহত হতে পারতেন, যেমন হয়েছিলেন সহ-বন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হক। কিন্তু নিজের মৃত্যুর চাইতে দেশের মুক্তির ভাবনাই সর্বদা তাঁর সারা মন জুড়ে থাকত। তাই ২৫ মার্চ বিকালের দিকেই তিনি যখন জানতে পারলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং পাকবাহিনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাবার নির্দেশ দিলেন কিন্তু নিজে তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে পালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এ প্রসঙ্গে মার্কিন লেখক রবার্ট পেইন তাঁর *ম্যাসাকার* গ্রন্থে লিখেছেন :

'মাঝরাত নাগাদ তিনি (বঙ্গবন্ধু) বুঝতে পারলেন যে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাঁর টেলিফোন অবিরাম বেজে চলেছে, কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর দূর থেকে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে। তখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে পূর্বপাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাকগুলি ও রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তর আক্রান্ত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান সামরিকবাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। তাই সে-রাতেই, ২৬ মার্চ, তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। সর্বত্র বেতারযোগে পাঠাবার জন্য তিনি নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিকটেশন দেন।'

রবার্ট পেইন লিখেছেন বাণীটি ছিল নিম্নরূপ :

'পাকিস্তান সামরিকবাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন।'

বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তাঁর সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে জেনারেল ওসমানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার সালিকের একটি বই-এর উল্লেখ করে বলেছিলেন যে ২৫ মার্চ রাতে (ইংরেজি দিনপঞ্জি অনুযায়ী তখন ২৬ মার্চ শুরু হয় গেছে) ব্রিগেডিয়ার সালিক যখন টিক্কা খানের সঙ্গে বসে ছিলেন তখন ওয়্যারলেসে ভেসে আসছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর বাণীটি চট্টগ্রামে তাঁর বিশিষ্ট সহকর্মীদের কাছে পৌঁছে গেলে, ২৬ মার্চ দুপুরের আগেই, হ্যান্ডবিল আকারে তা চট্টগ্রাম শহরে বিলি করা হয়। হ্যান্ডবিলটি ছিল ইংরেজিতে, যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

'বাংলাদেশের জনগণ ও বিশ্বের জনগণের প্রতি : ২৬.৩.৭১ তারিখে জিরো আওয়ারে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী অকস্মাৎ পিলখানায় ইপিআর দপ্তর ও রাজারবাগে পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে। ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে এখনো যুদ্ধ চলেছে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণ বীরত্বের সঙ্গে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে। বাংলাদেশের প্রতি সেক্টরকে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া হলো। আল্লাহর করুণা আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। তিনি যেন স্বাধীনতাসংগ্রামে আপনাদের সাহায্য করেন।

জয় বাংলা।

স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান।'

২৬ মার্চ বিকালেও চট্টগ্রামে এই রকম শতাধিক হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হয়েছিল। সেই সন্ধ্যাতেই কালুরঘাটস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর বরাত দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ওই ঘোষণার তারিখ অনুযায়ীই আমরা ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছি। ওই ২৬ মার্চ তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও অন্যরকম একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

'My dear countrymen,

Assalamo Alaikum. In East Pakistan a noncooperation and disobedience movement was launched by the Awami League and matters took a very serious turn. Seikh Mujibur Rahman's action of starting the noncooperation movement is an act of treason. He and his party have defied the lawful authority for over three weeks. They have tried to run a parallel government. His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion. The

man and his party want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of in country. This crime will not go unpunished.

God be with you. God bless you.

Pakistan Paindabad.'

যে-সব কারণে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের এই বিষোদ্‌গীরণ ঠিক সেইসব কারণেই তিনি বাঙালির সবচাইতে প্রিয় মানুষ, তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে তিনি নিহত না হলেও, ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রেরণ করার অল্পক্ষণের মধ্যেই, হানাদার পাকবাহিনীর সদস্যদের হাতে তিনি বন্দি হন। তারা তাঁকে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের এক অজ্ঞাত বন্দিশালায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন দীর্ঘ নয় মাস তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেছেন, আর সেই নয় মাস উদ্দীপ্ত বাঙালি তাঁর দৃপ্ত মুখমণ্ডল হৃদয়ে স্থান দিয়ে, তাঁর উদাত্ত আহ্বানকে মূলমন্ত্র করে, তাঁর স্লোগান 'জয় বাংলা'কে কণ্ঠে ধারণ করে, স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে।

১৯৭১-এর ২৭ মার্চ তারিখে মেজর জিয়ার কণ্ঠেও কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ইংরেজিতে সে-ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ :

'On behalf of our great national leader, the supreme commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, I hereby proclaim the independence of Bangladesh. The Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of 7.5 million people of Bangladesh and the government headed by him is the only legitimae government of the people of the independent sovereign state of Bangladesh which is legally and constitutionally formed and worthy of being recognized by all the governments of the world. May Allah help us. Joi Bangla.'

মুক্তযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের যে প্রবাসী সরকার গঠিত হয় তার রাষ্ট্রপতিও ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে সৈয়দ নজরুর ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাজউদ্দিন আহমদ এবং বঙ্গবন্ধুর কতিপয় ঘনিষ্ঠ সহকর্মী বঙ্গবন্ধুর নামেই তখন সরকার পরিচালনা করেন। সমগ্র বিশ্বের কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের

প্রাণপুরুষ, বলতে গেলে বাংলাদেশই। ২৮ মার্চ লন্ডনের দি অবজ্ঞার্ভার পত্রিকার বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সিরিল ডান লিখেছেন :

'Although it has taken Sheikh Mujibur Rahman more than twenty years to bring his life to its present stunning climax, the liberation of his homeland East Pakistan from its status as a colony of West Pakistan has always been his aim. Whatever may be said against him he is not a political opportunist.'

এ উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনে সুবিধাবাদের সামান্যতম ছায়াপাত ঘটে নি। নিয়মতান্ত্রিক পথে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি অবস্থা থেকে মুক্ত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পরই তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে যান। আমাদের মনে পড়ে ১৯৭১-এর ১৫ মার্চে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনটির কথা। তাতে লেখা হয়েছিল, পূর্ববাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিব ড্যান কগিনকে ঢাকায় বললেন, 'পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে, সমঝোতার কোনো সুযোগ নেই।' তারপর টাইম মন্তব্য করে, 'যদি শেখ মুজিব ডাক দেন তবে পূর্বপাকিস্তান ও পাকিস্তানের ৬০ হাজার সৈন্যের মধ্যে খোলা যুদ্ধ বেধে যাবে।' এবং যুদ্ধ সত্যিই বেধে যায়। চীন ও মার্কিন সরকার ছাড়া গোটা বিশ্ব বাংলাদেশকে নৈতিক সমর্থন দেয়। বিশেষ করে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। নৈতিক সমর্থন দানের চাইতে ভারত আরো বেশি কিছু করে। মার্কিন সরকারের অবস্থান যা-ই থাকুক, বিপুলসংখ্যক মার্কিন জনগণও ছিল বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ফ্রান্সের নন্দিত সাহিত্যিক আঁদ্রে মলরোর একটি ঘোষণা যুদ্ধরত বাঙালিদের অসম্ভব অনুপ্রাণিত করেছিল। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতের জয়প্রকাশ নারায়ণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন ও মলরোকে তাতে আমন্ত্রণ জানান। মলরো সে-আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি কিন্তু একটি অবিস্মরণীয় চিঠিতে তিনি বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে তিনি মুক্তিবাহিনীর অধীনে একটি দল পরিচালনা করতে চান। বাংলাদেশের যোদ্ধাদের তিনি গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ প্রথাগত যুদ্ধে একটি পেশাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা টিকে থাকতে পারবে না। সে সময় বিশ্বের একজন প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতিকেও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন :

'পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রমশালী সেনাবাহিনীকে যদি নগ্নপদ ভিয়েতনামীদের হাতে নাজেহাল হতে হয়, তাহলে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ইসলামাবাদের সেনাবাহিনী বারো'শ মাইল দূর থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত একটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে?'

সক্ষম যে হয় নি ইতিহাস তার সাক্ষী। রাষ্ট্রপতি হিসাবে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবাসী সরকারের পরিচালনায় সকল মুক্তিযুদ্ধের শেষে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের বিজয় অর্জিত হলো। জন্ম নিল বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্র। কিন্তু বাঙালির আনন্দ সেদিন পূর্ণতা পেল না। কারণ বিজয়ের প্রকৃত নায়ক বঙ্গবন্ধু তখনো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লায়ারপুর সামরিক জেলে তাঁর গোপন বিচার শুরু হয়। বিচারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে প্রাণদণ্ড প্রদান করা হলে সারা বিশ্বে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানাল। ২৭ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের দাবি জানানো হলো। ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হলো, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, তিনি বাংলাদেশের স্থপতি। ৩ জানুয়ারি (১৯৭২) করাচি শহরের নিশ্‌তার পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভুট্টো ঘোষণা করেন শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তিদান করা হবে। এ সিদ্ধান্ত সর্বত্র অভিনন্দিত হয়। বিলেতের দি গার্ডিয়ান পত্রিকা তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলে :

'Sheikh Mujibur Ranman is the true maker of Bangladesh. It was his magical oratory which converted Bengali discontent into a powerful political party programme.'

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। তিনি সেদিনই স্বদেশের উদ্দেশে লন্ডন যাত্রা করেন। লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ তাঁকে ব্যতিক্রমী সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান।

বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের একটি বিমানযোগে দিল্লি হয়ে ঢাকায় ফেরেন। দিল্লি বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। জাতির জনক ১০ জানুয়ারি দেশের মাটিতে পদার্পণ করলে বিমানবন্দরে তাঁকে যে অভ্যর্থনা জানানো হয় তা ছিল তুলনাহীন। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লাখো জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাঁর যাত্রাপথের দু'পাশে অবস্থান গ্রহণকারী লক্ষাধিক নাগরিক জয়বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রেসকোর্স ময়দানে ওই সংবর্ধনা সভায় জাতির জনক আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন :

'গত ৭ মার্চ (১৯৭১) এই ঘোড়দৌড়ের ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলার মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয় নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।'

তিন আরো বলেন,

'আপনারা আরও জানেন যে আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেল-এর পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আমি তাদের নিকট নতিস্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা।'

জাতির জনকের উপযুক্ত ভাষণই বটে। এ পর্যায়ে জাতির জনক অভিধাটি প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা যাক। এ অভিধাটি অনেকে অপছন্দ করলেও এটি একটি সুপ্রচলিত শব্দগুচ্ছ। জাতি বলতে এখানে অবশ্য জাতি-রাষ্ট্রকেই বোঝায়। আমরা সবাই জানি যে কোনো একক ব্যক্তি একটি জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন না, কেউই তাঁর একক চেষ্টায় পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে একটা নতুন জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম দেন না। বহুকাল ধরে সেই সংগ্রাম চলে, বহু মানুষ সেই সংগ্রামে অংশ নেয়, বহু লোক আত্মাহুতি দেয়। তবু একথাও আমরা জানি যে ইতিহাসের কোনো কোনো পর্বে, কোথাও কোথাও, একক ব্যক্তি এমন বিপুল বিশাল ভূমিকা পালন করেন, তাঁর অবদান এত কেন্দ্রীয় ও চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, ক্যাটালিটিক এজেন্ট হিসাবে তাঁর কর্মকাণ্ড এত ফলপ্রসূ হয় যে তখন মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মাথায় জাতির পিতার শিরোপা পরিয়ে দেয়। এভাবেই আমরা পেয়েছি ভারতের মহাত্মা গান্ধীকে, পাকিস্তানের কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহকে, নয়া তুরস্কের কামাল আতাতুর্ককে এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবকে।

যে পর্যায়ক্রমিক সংগ্রাম ও আন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল তার প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাজনের পর আমরা একটা মেকি স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু দ্রুত মোহভঙ্গের পর ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বাঙালির সংগ্রামী তৎপরতায় শেখ মুজিবের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্লাবী হয়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তানের এই অঞ্চলের ভিতকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে

যায়, বাংলাদেশের গোর্কিরই মতো। আর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর জেগে ওঠে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন তরুণ জাতিরাষ্ট্র।

কয়েক বছর আগে একটি সংস্থা থেকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। তার ওপরে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের কতিপয় উচ্চবিন্দু আমি এইভাবে চিহ্নিত করেছিলাম। ৬ দফা আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংহত করতে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর দূরদর্শিতা, ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি ঊনসত্তর ও সত্তরের গণআন্দোলন সঠিক পথে পরিচালনা করেন, দুর্বার দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য পড়ে তোলেন এবং বাঙালির চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আকাশচুম্বী করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার যে অতুলনীয় আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তার কথা।

কিন্তু শুধু স্বাধীনতা-পূর্বকালে তাঁর অবদানের কথাই বলবো? স্বাধীনতা-উত্তরকালেও কি তাঁর ভূমিকা কম গৌরবোজ্জ্বল ছিল? মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির সামনে স্তূপীকৃত পর্বতপ্রমাণ সমস্যার সমাধানে তিনি অসামান্য দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর আহ্বানে রণক্ষেত্র থেকে সদ্যপ্রত্যাগত মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যদের অস্ত্র সমর্পণ, চিন্তাতীত স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাদানকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ভূখণ্ড ত্যাগ এবং আবারো চিন্তাতীত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি আধুনিক, উন্নত, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, জনকল্যাণমুখী সংবিধান প্রণয়ন।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহৃত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে কি ঘটেছে তার কথা একবার স্মরণ করলেই এ ঘটনার বিশাল তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু এবং ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে যে-সংলাপ হয়েছিল তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আলোকসঞ্চারী। একটু উদ্ধৃতি দিই :

শেখ মুজিব : মাদাম, আপনি কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন?

ইন্দিরা গান্ধী : বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে আছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা হবে।

শেখ মুজিব : মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ত্রিশ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেক লোকের মৃত্যু হয় আমি সে অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনার

অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধী : এক্সেলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

শেখ মুজিব : মাদাম, কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন?

ইন্দিরা গান্ধী : এক্সেলেন্সি, প্রাইমমিনিস্টার, ১৭ মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড় সাফল্য স্বাধীনতার নয় মাসের মধ্যে দেশকে একটি চমৎকার সংবিধান উপহার দেয়া। এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চার মূল স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হবার সময়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে এ-বিষয়ে অতি স্বচ্ছ, যুক্তিনির্ভর আলোকসঞ্চারী বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন সংগ্রামী ঐক্যের ওপর, অনুভূতির ওপর। বাঙালি তো কখনো ভুলতে পারবে না কী উদ্দীপক ভাবে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জয় বাংলা' প্রভৃতি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তখন সে-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল। সেদিন গণপরিষদের দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন :

'ভাষাই বলুন, শিক্ষাই বলুন, সভ্যতাই বলুন, আর কৃষ্টিই বলুন, সকলের সাথে একটা জিনিস রয়েছে, সেটা হলো অনুভূতি। এই অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে কোনো জাতি বড় হতে পারে না এবং জাতীয়তাবাদ আসতে পারে না। অনেক জাতি দুনিয়ায় আছে, বিভিন্ন ভাষাবলম্বী হয়েও এক জাতি হয়েছে। অনেক দেশ আছে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই সব কিছু কিন্তু সেখানে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠেছে, তারা একটি জাতিতে পরিণত হতে পারে নাই... আজ বাঙালি জাতি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল যার ওপর ভিত্তি করে, এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে, সেই অনুভূতি আছে বলেই আমি বাঙালি, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ।'

গণতন্ত্র সম্পর্কেও বাংলাদেশের কী ধরনের গণতন্ত্র অনুসৃত হবে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কোথাও কোথাও মেকি গণতন্ত্র শোষকদের স্বার্থরক্ষার কাজ করে, সে-রকম গণতন্ত্র বাংলাদেশ চায় না। শোষিতের গণতন্ত্র বলতে তিনি সেই গণতন্ত্র বোঝাতে চেয়েছিলেন যা দুঃখী দরিদ্র বঞ্চিত মানুষকে রক্ষা করবে, শোষকদের নয়। স্পিকারকে উদ্দেশ করে বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন :

'...আমাদের গণতন্ত্রের সাথে অন্যের পার্থক্য আছে... আমরা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছি না, কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয় সেই চক্রকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করেছি। তার মানে হলো, শোষকগোষ্ঠী যেন এই গণতন্ত্র ব্যবহার করতে না পারে... সেজন্য এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকের সংজ্ঞার পার্থক্য হতে পারে।'

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা ছিল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষেরই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেছিলেন :

'আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেইমানি... এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।'

সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র যে অন্য কোনো দেশ থেকে ধার করে আনা সমাজতন্ত্র হবে না তা তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে... রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে চীন তা করে নি... রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে চলেছে...।'

আমাদেরকেও যে আমাদের নিজস্ব পন্থায় অগ্রসর হতে হবে এ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর মনে কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিল না।

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মূল্যবোধগুলিকে তিনি যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি যেরকম উদ্যোগ গ্রহণ করছিলেন, ইতিপূর্বে আর কাউকে আমরা তেমন করতে দেখি নি। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি যখন বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করে উপরোক্ত মূল্যবোধসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখনই তাঁকে হত্যা করা হলো। কেন তাঁকে হত্যা করা হলো? কারা তাঁর হত্যার জন্য দায়ী? এটা ভাবা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চিন্তাধারার বিপরীত শক্তি, দেশী ও বিদেশী,

এজন্য দায়ী। তাঁর আদর্শ ও কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে আঘাত করেছিল অবাধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে, বৃহৎ ব্যবসায়ী সমাজকে, দেশী-বিদেশী মুনাফালোভী মানুষ-হাঙরকে, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রকে আর সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য পদলেহী অনুচরদের। শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ তো কখনো একা চলে না। তার অপরিহার্য সঙ্গী হয় স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা দেশের ঐতিহ্যবর্জিত গণবিরোধী অপসংস্কৃতি। ধর্মকে ভিত্তি করে রাজনীতি করার সুযোগ চলে গেলে উপর তলার মুষ্টিমেয় মানুষ কীভাবে স্বাধীনতার তাবৎ সুফল তাদের কুক্ষিগত করবে? এই গরিব জনবহুল দেশের সীমিত সম্পদ যদি সুষমভাবে বন্টন করতে হয় তাহলে তাদের ভাগ্যে কতটুকু জুটবে? আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রও বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

সযত্নে সুকৌশলে বিস্তার করা হলো চক্রান্তের জাল। সেই চক্রান্তের সব ইতিহাস আজও জানা যায় নি, কিন্তু যতটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ব্যাপারটি শুধু কয়েকজন তরুণ সামরিক অফিসারের অ্যাডভেঞ্চারপ্রসূত ছিল না, এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে যোগসাজশ ছিল দেশের ও বিদেশের, সামরিক ও বেসামরিক, অনেক শক্তিধর পুরুষ ও সংস্থার।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশে যে-সব সরকার ক্ষমতায় আসীন হয় তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাসংগ্রামের যাবতীয় ইতিবাচক মূল্যবোধ, হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে, চাতুর্যের সঙ্গে, খণ্ডিত, বিকৃত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। তাদের আমলে বাংলাদেশের সংবিধান কয়েকবার ধর্ষিত হয়, জঘন্যভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগে প্রতিশোধ নেবার শক্তি নিয়ে আবার ফিরে আসে। একুশ বছর ধরে মিথ্যার ফুলঝুরি আর নির্লজ্জ প্রচারসর্বস্বতার আড়ালে দেশের মানুষ নীরন্ধ্র তমসার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। কিন্তু অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। রাহুর গ্রাস একসময় কেটেই যায়।

এখন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে। নতুন করে সুযোগ এসেছে বঙ্গবন্ধু যে-রকম বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন সেরকম বাংলাদেশ গড়ার কাজে সবার আত্মনিয়োগ করার। বঙ্গবন্ধু আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের স্মৃতি আছে আমাদের জন্য অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বহু চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ভারতের মনীষী-সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের ভাষায় :

'যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'

বঙ্গবন্ধুকে, তাঁর আদর্শকে, আমাদের মধ্যে ধরে রাখতেই হবে চিরসজীব করে। বাংলাদেশের এক কবির ভাষায় :

'তুমি (বঙ্গবন্ধু) না এলে তো স্বাধীনতা তোমার মতোন করে লিখবে না কেউ বিশাল অক্ষরে, তুমি না এলে তো খরা হবে, অনাবৃষ্টি হবে, দিন দিন শঙ্ক হবে পদ্মা মেঘনা রবীন্দ্রসঙ্গীতে। তুমি কি আসবে না তবু এই দগ্ধ ব্যথিত বাংলায়?' বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথা ভাবা যায় না। তিনি শুধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, তাঁর দেখা স্বপ্নের একটা অংশের বাস্তব রূপকারও ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা, তিনি নিজেকে উত্তীর্ণ করেছিলেন জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়কে। বঙ্গবন্ধুকে একবার এক বিদেশী সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর প্রধান গুণ হিসাবে তিনি কী চিহ্নিত করবেন? বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা। সেই সাংবাদিক তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর আপনার প্রধান দোষ? তার উত্তরেও বঙ্গবন্ধু হেসে বলেছিলেন দেশের মানুষের জন্য আমার ভালোবাসা। তাঁর মহৎ গুণাবলি, তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অসাধারণ সাহসিকতা, উদার মানবিকতাবোধ এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির জনক হিসাবে তাঁর অবদান গগনচুম্বী।

"বঙ্গবন্ধু : জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক " সঙ্কলন গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য ও তার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। একুশজন লেখক তাঁদের লেখা বঙ্গবন্ধুর জননায়কোচিত গুণাবলির ওপর জোর দিয়েছেন, বত্রিশজন লেখক জোর দিয়েছেন তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার ওপর। এছাড়া আহমাদ মাযহার বঙ্গবন্ধুর দুই সত্তার তুলনামূলক মূল্যায়ন করেছেন। ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড নিয়ে মর্মস্পর্শী একটি লেখা লিখেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। কয়েকজন লেখক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ গ্রন্থের কতিপয় লেখক বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁদের লেখার একটা স্বতন্ত্রমূল্য আছে। আর এখানে দুই পর্বে বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন-প্রয়াসের মাধ্যমে, আশা করা যায়, পাঠক সমাজে কতিপয় নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

বাহুল্যকথন থেকে নিবৃত্ত হয়ে আমার সম্পাদকের কথা আমি এখানেই শেষ করছি।

জয় বাংলা।

কবীর চৌধুরী
ঢাকা-১৬.১২.২০০৯

সূচি

সম্পাদকের কথা ৭

জননায়ক বঙ্গবন্ধু

শামসুর রাহমান/ধন্য সেই পুরুষ ৩৩

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা ৩৯

Dr. Kamal Hossain/SHEIKH MUJIB'S QUALITY OF LEADERSHIP ৫২

গাজীউল হক/ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ৫৯

কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী/৬-দফা বনাম ১-দফা ৬৩

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ/ছয়-দফা থেকে অসহযোগ :

বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠতম সময় ৬৮

শামসুজ্জামান খান/জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণ :

একটি অনুপুঙ্খ পাঠ ৭৮

কে এম সোবহান/ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র অধ্যায় ৮৭

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম/শেখ মুজিব : বাঙালির উপনিবেশমুক্তির রূপকার ৯৯

খোন্দকার মোজাম্মেল হক/যেভাবে মুজিব হলেন 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' ১০৬

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/শেখ মুজিবের অঙ্গীকার ১৩১

কবীর চৌধুরী/মুজিব মানে মুক্তি ১৩৭

আনিসুজ্জামান/বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন ১৪৩

সালাহ্উদ্দীন আহমদ/বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা ১৪৮

মুনতাসীর মামুন/বাঙালির মন ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ১৫৭

স্বদেশ রায়/স্থির লক্ষ্যের রাজনীতিক শেখ মুজিব ১৬২

বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন/বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধু ১৬৯

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী/জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৭৫

আব্দুল হালিম/বঙ্গবন্ধু : মানবতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক ১৭৯

অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম/আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি :

ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা ১৯১

রামেন্দ্র চৌধুরী/বাংলাদেশের জাতির জনক ঃ

বহুজনের বর্ণনায় বরণীয় বঙ্গবন্ধু ২০৩

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

হোসেন তওফিক হমাম/গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : মুজিবনগর ২২১

অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর/রাষ্ট্র গঠন ও জাতির জনক শেখ মুজিব ২৪০

কামরুদ্দীন আহমদ/স্বাধীনতা উত্তরকালে শেখ মুজিব ২৪৮

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত/বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ উন্নয়ন দৌড়ে কোথায় দাঁড়াতো? ২৫৬

ড. মো. মাহবুবর রহমান/যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ২৬১

ফারুক চৌধুরী/বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ২৬৮

ফারুক চৌধুরী/আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু ২৭৬

আবুল হাসান চৌধুরী/বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি ২৮৩

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন/মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান ২৮৭

ড. সুকুমার বিশ্বাস/বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৯৬

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর/বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের সিভিল সমাজ ৩০৬

মাহবুব উদ্দিন আহমদ/বঙ্গবন্ধু প্রশাসন ও তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৩০৯

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন/প্রশাসক মুজিব ৩১৮

সুলতান মাহমুদ শরীফ/রাষ্ট্রধর্ম ও বঙ্গবন্ধু ৩৩২

ড. মোহাম্মদ শাহাদত আলী/বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষক সমাজ ৩৩৯

ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য/বঙ্গবন্ধু, মানবাধিকার ও বাংলাদেশ ৩৪৩

ড. সেলিম জাহান/বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও সমবায় চিন্তা ৩৫১

খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ/বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক ভাবনা ৩৫৭

এ কে আজাদ চৌধুরী/গণমুখী শিক্ষা ও বঙ্গবন্ধু ৩৬৪

ড. অজিত কুমার দাস/বঙ্গবন্ধুর বাকশাল : পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ৩৬৮

ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া/১৯৭৫ সালে সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পটভূমি ৩৮৬

Dr. M Rafiqul Islam/CONTRIBUTION OF BANGABANDHU TO CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW ৩৯৮

Azizul Islam Bhuiyan/PROSPERITY OF BANGLADESH AS THE FOUNDING FATHER VISUALISED ৪০৬

আবুল মাল আবদুল মুহিত/বঙ্গবন্ধুর নজিরবিহীন অর্জন এবং অতুলনীয় কৃতিত্ব ৪১০

শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া/পেছনে ফিরে দেখা :
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করার বিরল সৌভাগ্য ৪১৫
ড. আতিউর রহমান/বঙ্গবন্ধুর নান্দনিক ভাবনা ৪২৫
হাশেম খান/বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব ৪৫১
তপন বাগচী/জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও যাত্রাপালা ৪৫৮
আনু মাহ্মুদ/বঙ্গবন্ধুর চলচ্চিত্র ভাবনা ৪৬৩
শামসুজ্জামান খান/নজরুল, বঙ্গবন্ধু ও 'জয় বাংলা' ৪৬৯
খালেক বিন জয়েনউদদীন/বিদ্রোহী কবির আগমন ও বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ৪৭৩
সেলিনা হোসেন/বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমী ৪৭৮

জননেতা ও রাষ্ট্রপিতা; দুই সত্তার মূল্যায়ন

আহমাদ মাযহার/শেখ মুজিব : জীবনের দুই পর্বে ৪৮৫

কাঁদো, প্রিয় দেশ

শেখ হাসিনা/ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ৪৯৩

পরিশিষ্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও কর্ম ৪৯৯